হানেমান্

অর্গানন অফ মেডিসিন

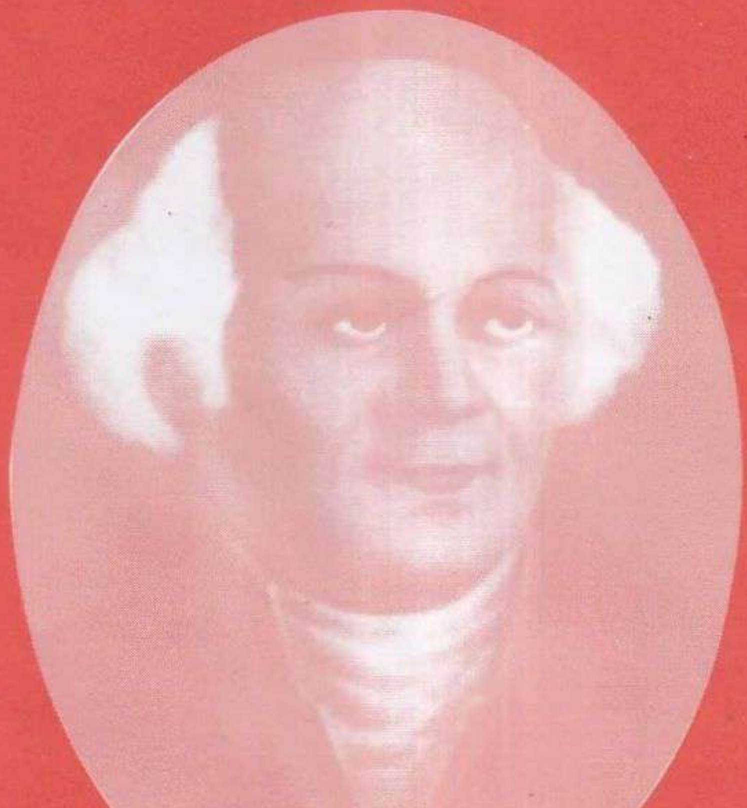

ডাঃ ত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্তসার

ভূমিকা ঃ

আকস্মিক হোমিওপ্যাথিক আরোগ্যের দৃষ্টান্ত। যাঁহারা চিকিৎসা ব্যবসায়ী নহেন তাঁহারাও সাদৃশ্য নীতি অবলম্বিত চিকিৎসাকে একমাত্র কার্যকরী পদ্ধতি বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। এমন কি, কয়েকজন প্রাচীনচিকিৎসকও ইহাকে সর্বোত্তম চিকিৎসাপ্রণালী বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন।

অর্গাননের মূল অংশ ঃ

১-২ ঃ দ্রুত, শান্ত ও স্থায়িভাবে আরোগ্য বিধান করাই হইল চিকিৎসকের একমাত্র উদ্দেশ্য।

টীকা ঃ কাল্পনিক পদ্ধতি রচনা ও তাহার ব্যাখ্যার চেষ্টা না করিয়া।

৩-৪ ঃ রোগে আরোগ্যের বিষয় অনুসন্ধান এবং বিভিন্ন ঔষধের কার্যকরী শক্তি কি তাহা জানা, যাহাতে রোগে ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে; এবং মানুষের স্বাস্থ্য কিভাবে রক্ষা করা যায় সে সম্বন্ধে জ্ঞান।

৫ ঃ উত্তেজক কারণ, মূলকারণ এবং আরোগ্যের সহায়ক অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।

৬ ঃ রোগের সমষ্টিগত লক্ষণই হইল রোগ।

টীকা ঃ পুরাতনপন্থীগণের রোগের মূলকারণ নির্ণয়ে বৃথা চেষ্টা।

৭ ঃ ঐ সকল বিষয়ে (সূত্র ৫) দিকে মন দিলেও আরোগ্য প্রদান করিতে হইলে (চিকিৎসকের প্রয়োজন শুধু লক্ষণসমষ্টিকে দূর করা।

টীকা ১ ঃ যে সকল কারণ স্পষ্টত রোগ সৃষ্টি করে এবং তাহা বজায় রাখে তাহা দূর করিতে হইবে।

২ ঃ একটি লক্ষণকে লক্ষ্য করিয়া সাময়িক উপশমকারী ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা বর্জনীয়।

৮ ঃ যদি সকল লক্ষণ অন্তর্হিত হয় আভ্যন্তরিক রোগও তাহা হইলে নিরাময় হয়।

টীকা ঃ পুরাতনপন্থীগণ নির্বুদ্ধিতাবশত ইহা স্বীকার করেন না।

৯ ঃ সুস্থ অবস্থায় একটি অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মশক্তি (জীবনীশক্তি) দেহযন্ত্রকে সঞ্জীবিত রাখে এবং সুষ্ঠুভাবে তাহাকে পরিচালনা করে।

১০ ঃ এই শক্তি ব্যতিরেকে দেহ মৃত।

১১ ঃ রোগে জীবনীশক্তিই মূলত পীড়িত হয়, এবং তাহার রোগযন্ত্রণাকে (আভ্যন্তরিক পরিবর্তন) অস্বাভাবিক অনুভূতি ও দেহযন্ত্রের ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করে।
'ডাইনামিস' শব্দের ব্যাখ্যা।

১২ ঃ লক্ষণসমষ্টি অন্তর্হিত হইলে জীবনীশক্তির পীড়া অর্থাৎ সামগ্রিক আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য পীড়া অবস্থাও দূরীভূত হয়।
টীকা ঃ আরোগ্যের জন্য জীবনীশক্তি কেমন করিয়া লক্ষণসমূহ সৃষ্টি করিল তাহা জানা প্রয়োজন নাই।

১৩ ঃ যে সকল রোগ অস্ত্র চিকিৎসার অধীন নহে সেগুলিকে দেহের ভিতরে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত চিন্তা করা অসঙ্গত। এই ধারণাই অ্যালোপ্যাথিকে এত ক্ষতিকর চিকিৎসায় পরিণত করিয়াছে।

১৪ ঃ আরোগ্যযোগ্য যাহা কিছু রোগ চিকিৎসকের কাছে রোগলক্ষণরূপে ধরা দেয়।

১৫ ঃ জীবনীশক্তির পীড়া এবং তাহার ফলে উদ্ভূত লক্ষণসমূহ অভিন্ন।

১৬ ঃ কেবলমাত্র রোগোৎপাদক সূক্ষ্মশক্তি দ্বারাই জীবনীশক্তি পীড়িত হয়, আবার সেইভাবে ঔষধের সূক্ষ্ম ক্রিয়া দ্বারাই আরোগ্যলাভ হয়।

১৭ ঃ চিকিৎসকের প্রয়োজন কেবল রোগলক্ষণকে দূরীভূত করা, তাহা হইলেই সমগ্র রোগ দূরীভূত হইবে।
টীকা ঃ তাহার দৃষ্টান্ত।

১৮ ঃ ঔষধ নির্বাচনের জন্য লক্ষণসমষ্টিই একমাত্র পথপ্রদর্শক।

১৯ ঃ ঔষধসমূহ স্বাস্থ্যের বিকৃতি উৎপাদন করিতে পারে বলিয়াই তাহারা রোগজনিত লক্ষণসমূহ দূর করিতে পারে, নতুবা নহে।

২০ ঃ ঔষধসমূহের স্বাস্থ্যের বিকৃতি সাধন করিবার ক্ষমতা জানা যায় কেবলমাত্র তাহাদের সুস্থ শরীরের উপর ক্রিয়া দ্বারা।

২১ ঃ সুস্থ শরীরে ঔষধসমূহ যে বিকৃতি সাধন করে তাহাই একমাত্র বিষয় যাহা হইতে আমরা তাহাদের রোগ আরোগ্যকারী ক্ষমতা জানিতে পারি।

২২ ঃ অভিজ্ঞতা হইতে যদি জানা যায় যে রোগের সদৃশ লক্ষণ প্রকাশক ঔষধ দ্বারা নিশ্চিত ও স্থায়িভাবে রোগ নিরাময় হইবে তাহা হইলে আমরা অবশ্যই আরোগ্যের জন্য সদৃশ লক্ষণ প্রকাশক ঔষধই নির্বাচন করিব, কিন্তু যদি দেখা যায় রোগ

নিশ্চিত ও স্থায়িভাবে বিপরীত লক্ষণ প্রকাশক ঔষধ দ্বারা আরোগ্যপ্রাপ্ত হইবে তাহা হইলে আমরা বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট ঔষধই নির্বাচন করিব।

টীকা ঃ রোগলক্ষণের সহিত যে ঔষধের কোন বাস্তব যোগ নাই, বরং যাহা দেহের উপর বিভিন্ন প্রণালীতে কার্য করে তাহা অ্যালোপ্যাথিক পদ্ধতি, তাহা বর্জনীয়।

২৩ ঃ স্থায়ী রোগলক্ষণ বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট ঔষধ (অ্যান্টিপ্যাথিক) দ্বারা আরোগ্যপ্রাপ্ত হয় না।

২৪-২৫ ঃ এতদ্ব্যতীত চিকিৎসাপদ্ধতি হইল হোমিওপ্যাথি, সদৃশ লক্ষণবিশিষ্ট ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা। অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় তাহাই হইল একমাত্র হিতকারী পদ্ধতি।

২৬ ঃ ইহা নির্ভর করে প্রকৃতির আরোগ্যনীতির উপর; জীবন্ত দেহে একটি প্রবলতর সদৃশ রোগ, প্রকৃতিতে বিভিন্ন অন্য একটি রোগকে সূক্ষ্মভাবে স্থায়িরূপে ধ্বংস করিতে পারে।

টীকা ঃ ইহা শারীরিক ও মানসিক—উভয়বিধ ব্যাধির প্রতিই প্রযোজ্য।

২৭ ঃ অতএব ঔষধের আরোগ্যকারী ক্ষমতা নির্ভর করে রোগের সদৃশ লক্ষণের উপর।

২৮-২৯ ঃ এই আরোগ্যনীতির ব্যাখ্যা।

৩০-৩৩ ঃ প্রাকৃতিক রোগ অপেক্ষা ঔষধজ শক্তি দ্বারা দেহের স্বাস্থ্য পরিবর্তিত হওয়ার প্রবণতা অধিকতর।

৩৪-৩৫ ঃ হোমিওপ্যাথিক আরোগ্যনীতির সত্যতা প্রমাণিত হয় পুরাতন পীড়ায় অসদৃশ লক্ষণ চিকিৎসার ব্যর্থতা দ্বারা। এখানে দুইটি অসদৃশ রোগ একই দেহে মিলিত হইয়া পরস্পরকে দূরীভূত করিতে বা আরোগ্য প্রদান করিতে পারে না।

৩৬ (ক) ঃ দেহে অবস্থিত পুরানো রোগটি যদি সমান বলশালী বা প্রবলতর হয় তাহা হইলে বিসদৃশ নূতন আগন্তুক রোগকে তাড়াইয়া দেয়।

৩৭ ঃ সেজন্য অসদৃশ চিকিৎসায় চিররোগ যেমন ছিল তেমনি থাকে।

৩৮ (খ) ঃ কিংবা আগন্তুক নূতন ব্যাধি যদি অধিকতর প্রবল হয় তাহা হইলে যতদিন তাহার ভোগকাল থাকে পুরাতন রোগটিকে চাপা দিয়া রাখে, কিন্তু দূরীভূত করিতে পারে না।

৩৯ ঃ এইজন্য অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা প্রচন্ড চিকিৎসায় চিররোগ সারে না, কেবল যতদিন ঔষধের ক্রিয়া চলে ততদিন চাপা থাকে। তাহার পর পুরাতন রোগটি আবার পূর্বের মতো বা বর্ধিত আকারে দেখা দেয়।

৪০ (গ) ঃ কিংবা নবাগত রোগটি অনেকদিন অবস্থানের পর বিসদৃশ পুরাতন রোগটির সহিত মিলিত হইয়া একটি জটিল রোগের সৃষ্টি করে, একটি অপরটিকে দূর করে না।

৪১ ঃ যদিও দুইটি বিসদৃশ রোগের একই দেহে মিলন বিরল নহে, তথাপি তাহা বেশি দেখা যায় কড়া অ্যালোপ্যাথিক ঔষধের অযথা প্রয়োগে, যেখানে ঔষধজ রোগ পুরাতন প্রাকৃতিক বিসদৃশ রোগের সহিত জোট বাঁধে, ফলে চিররোগী অধিকতর পীড়িত হয়।

৪২ ঃ এই সকল বিসদৃশ ব্যাধি পরস্পর জড়িত হইয়া দেহে আপন আপন স্থান বাছিয়া লয়।

৪৩-৪৪ ঃ কিন্তু পূর্বে অবস্থিত কোন সদৃশ রোগের ক্ষেত্রে বলবত্তর অন্য কোন রোগের আবির্ভাবের ফল হয় অন্যরূপ। এই ক্ষেত্রে প্রথমোক্তটি দ্বিতীয়টি দ্বারা দূরীভূত হয় ও আরোগ্যপ্রাপ্ত হয়।

৪৫ ঃ এই ঘটনার ব্যাখ্যা।

৪৬ ঃ সদশ প্রবলতর রোগের আকস্মিক আবির্ভাব দ্বারা চিররোগসমূহের আরোগ্যপ্রাপ্তির দৃষ্টান্ত।

৪৭-৪৯ ঃ প্রাকৃতিক নিয়মে যে ক্ষেত্রে দুইটি রোগের একই সঙ্গে আবির্ভাব ঘটে, সেখানে লক্ষণের সাদৃশ্য দ্বারা একটি অপরটিকে দূরীভূত করিতে পারে, বিসদৃশ লক্ষণ দ্বারা তাহা কখনই সম্ভব নহে। চিকিৎসককে ইহাই শিক্ষা দেয় কোন্ প্রকারের ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে, অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিক ছাড়া অন্য কিছু নহে।

৫০ ঃ হোমিওপ্যাথি মতে রোগ আরোগ্যের জন্য প্রকৃতির অল্প কয়েকটি রোগই আছে এবং সেগুলিকে ব্যবহার করার অসুবিধাও অনেক।

৫১ ঃ অপরপক্ষে তাহা অপেক্ষা সুবিধাজনক অনেক ঔষধ চিকিৎসকের হাতে আছে।

৫২ ঃ দুইটি মাত্র প্রধান চিকিৎসাপদ্ধতি—হোমিওপ্যাথি ও অ্যালোপ্যাথি এবং তাহারা সম্পূর্ণ বিপরীত, একটির সহিত অপরটির মিল হইতে পারে না।

৫৩ ঃ অভ্রান্ত প্রাকৃতিক নীতির উপরই হোমিওপ্যাথির ভিত্তি, এবং সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত।

৫৪ ঃ অ্যালোপ্যাথিক পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকার প্রণালীর সমবায়ে গঠিত এবং তাহাই যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসাপদ্ধতি বলিয়া প্রচারিত। এই পদ্ধতিতে রোগবস্তু খুঁজিয়া বাহির করা হয় এবং তদনুসারে কল্পনামূলক মেটিরিয়া মেডিকা রচিত হয় এবং মিশ্র ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়।

৫৫-৫৬ ঃ অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার ক্ষতিকর পদ্ধতিতে সাময়িক উপশমকারী ঔষধ ভিন্ন আর কিছু নাই এবং তাহাই এখনও রোগীদের বিশ্বাস বজায় রাখিয়াছে।
টীকা ঃ আইসোপ্যাথি।

৫৭ ঃ অ্যান্টিপ্যাথিক বা সাময়িক উপশমকারী চিকিৎসায় বিপরীত ক্রিয়াবিশিষ্ট ঔষধ দ্বারা একটি লক্ষণ ধরিয়া চিকিৎসা করা হয়। উদাহরণ।

৫৮ ঃ এই অ্যান্টিপ্যাথিক পদ্ধতি একটি লক্ষণকে উদ্দেশ্য করিয়া চিকিৎসা করা হয় বলিয়া কেবল ত্রুটিপূর্ণ তাহা নহে, দীর্ঘস্থায়ী পীড়ায় সাময়িক উপশম দিলেও তাহার পরে ইহা বৃদ্ধি আনয়ন করে।
টীকা ঃ ইহার সমর্থনে বিভিন্ন চিকিৎসকের মতামত।

৫৯ ঃ কতকগুলি অ্যান্টিপ্যাথিক চিকিৎসার ক্ষতিকর প্রভাব।

৬০ ঃ উপশমকারী ঔষধের ক্রমবর্ধিত মাত্রার পুনঃপুন ব্যবহারে কখনই পুরাতন রোগ সারে না, বরং ক্ষতি করে।

৬১ ঃ তাহা হইতে চিকিৎসকগণের বুঝা উচিত যে তাহার বিপরীত অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিই উত্তম চিকিৎসাপদ্ধতি।

৬২ ঃ উপশমদায়ী চিকিৎসার অপকারিতা এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার উপকারিতার কারণ প্রদর্শন।

৬৩ ঃ তাহা নির্ভর করে ঔষধের মুখ্য ও জীবনীশক্তির গৌণ ক্রিয়ার পার্থক্যের উপরে।

৬৪ ঃ মুখ্য ও গৌণ ক্রিয়ার ব্যাখ্যা।

৬৫ ঃ উভয়ের দৃষ্টান্ত।

৬৬ ঃ চিকিৎসায় স্বল্পমাত্রার হোমিওপ্যাথিক ঔষধের প্রয়োগে যে সামান্য প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয় তাহা স্বাস্থ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে সহায়ক হয়।

৬৭ ঃ এই সকল সত্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার হিতকারিতা এবং অ্যান্টিপ্যাথির চিকিৎসার অপকারিতা নির্দেশ করে।

টীকা ঃ যে সকল ক্ষেত্রে অ্যান্টিপ্যাথিক চিকিৎসা অনুমোদনযোগ্য তাহার নির্দেশ।

৬৮ ঃ এই সকল সত্য হইতে কেমন করিয়া হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতা প্রমাণ করা যায়?

৬৯ ঃ অ্যান্টিপ্যাথিক চিকিৎসার ক্ষতিকারিতা এই সকল সত্য হইতে কিভাবে প্রমাণিত হয়?

টীকা (১) ঃ মানুষের চেতনায় দুইটি বিপরীত অনুভূতি পরস্পরকে প্রশমিত করে না, সেজন্য রসায়নাগারের দুইটি বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট বস্তুর মতো তাহারা নহে।

(২) ঃ উদাহরণ দ্বারা তাহার প্রমাণ।

৭০ ঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাপদ্ধতির সারমর্ম বর্ণনা।

৭১ ঃ আরোগ্যের জন্য প্রয়োজন তিনটি বিষয় ঃ

(১) রোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান, (২) ঔষধের ক্রিয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান, (৩) তাহার যথাযথ প্রয়োগ।

৭২ ঃ রোগ সম্বন্ধে সাধারণ পরিচয় ঃ অচির (acute) ও চির (chronic)।

৭৩ ঃ অচির রোগসমূহ—যাহা একটি লোককে, এখানে সেখানে কতকগুলি লোককে মহামারীরূপে আক্রমণ করে; অচির রোগবীজ।

৭৪ ঃ চিররোগসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকট হইল সেইগুলি যাহা অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের অদূরদর্শিতার ফলে সৃষ্ট হয়। ব্রুসোর বলহানিকর অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা।

৭৫ ঃ এইগুলি সর্বাপেক্ষা দুশ্চিকিৎস্য।

৭৬ ঃ জীবনীশক্তির যদি তখনও যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি থাকে তবেই ক্ষতিপূরণ সম্ভব এবং তাহাও সময়সাপেক্ষ, সেই সঙ্গে যদি মূল ব্যাধিকে হোমিওপ্যাথি মতে নির্মূল করা হয়।

৭৭ ঃ অযথা নামধেয় চিররোগসমূহ।

৭৮ ঃ যথার্থ চিররোগসমূহ, যাহা চিররোগবীজ হইতে উৎপন্ন।

৭৯ ঃ সিফিলিস ও সাইকোসিস।

২০৪-২০৫ ঃ যে সকল রোগকে প্রকৃত চিররোগ বলা যায় (যেগুলি অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা হইতে উৎপন্ন নহে) সেগুলিকে ভিতর হইতে চিকিৎসা করিতে হইবে এবং অন্তর্নিহিত রোগবীজ অনুসারে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সঠিকভাবে প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে নির্মূল করিতে হইবে।

২০৬ ঃ চিররোগ চিকিৎসায় প্রাথমিক অনুসন্ধান করিতে হইবে অন্তর্নিহিত রোগবীজ (miasm) সম্বন্ধে। তাহা একক, কিংবা অন্য রোগবীজের সহিত মিশ্রিত হইয়া জটিল আকার ধারণ করিয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে হইবে।

২০৭ ঃ পূর্বে যে চিকিৎসা অনুসৃত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান।

২০৮-২০৯ ঃ চিরপীড়ার চিত্র বুঝিবার জন্য অন্যান্য বিষয়ের প্রাথমিক অনুসন্ধান।

২১০-২৩০ ঃ তথাকথিত মনোরোগ ও মানসিক উত্তেজনাজনিত পীড়ার চিকিৎসা।

২৩১-২৩২ ঃ সবিরাম এবং পরিবর্তী রোগসমূহ (the intermittent and alternating diseases)।

২৩৩-২৩৪ ঃ নির্দিষ্ট সময়ান্তে বিরামশীল রোগসমূহ।

২৩৫-২৪৪ ঃ সবিরাম জ্বরসমূহ।

২৪৫-২৫১ ঃ ঔষধসমূহ ব্যবহারের পদ্ধতি।

টীকা ঃ সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা অনুসারে মাত্রার পুনঃপ্রয়োগ বিধি।

২৫২-২৫৬ ঃ উন্নতি সুরু হওয়ার লক্ষণ।

২৫৭-২৫৮ ঃ প্রিয় ঔষধের প্রতি পক্ষপাতিতা এবং অন্যান্য ঔষধের প্রতি অযথা বিরাগ।

২৫৯-২৬১ ঃ চিররোগে পথ্যাদির ব্যবস্থা।

টীকা ঃ জীবনযাত্রায় ক্ষতিকর দ্রব্যসমূহ।

২৬২-২৬৩ ঃ অচির পীড়ায় পথ্য।

২৬৪-২৬৬ ঃ সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী ঔষধের নির্বাচন।

টীকা ঃ খাদ্যরূপে প্রস্তুত করিবার সময়ে কতকগুলি পদার্থের রূপান্তর প্রাপ্তি।

২৬৭ ঃ টাটকা গাছগাছড়া হইতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং স্থায়ী ধরণের ঔষধ প্রস্তুতি।

২৬৮ : শুষ্ক উদ্ভিজ্জ পদার্থসমূহ।
টীকা : দীর্ঘস্থায়ী চূর্ণ প্রস্তুতের পদ্ধতি।

২৬৯-২৭১ : স্থূল বস্তুসমূহকে হোমিওপ্যাথিক প্রক্রিয়ায় ক্রিয়াশীল করিয়া তাহাদিগকে শক্তিশালী ঔষধরূপে উন্নয়ন।

২৭২-২৭৪ : যে কোন সময়ে রোগীকে একটি মাত্র অবিমিশ্র ঔষধ দিতে হইবে।

২৭৫-২৮৩ : হোমিওপ্যাথিক মতে ব্যবহারের জন্য ঔষধের শক্তি—কিভাবে তাহা বাড়ানো কমানো যায়। বৃহৎ মাত্রায় ব্যবহারে বিপদ।

২৮৪ : দেহের কোন্ কোন্ অংশে ঔষধের প্রভাব বেশি বা কম?

২৮৫ : ঔষধে বাহ্য ব্যবহার। খনিজ প্রস্রবণে স্নান।

২৮৬ : তড়িৎ ও গ্যালভানিক বিদ্যুৎ।

২৮৭ : খনিজ চুম্বক।

২৮৮-২৮৯ : মেসমেরিজম (সম্মোহন)।

২৯০ : সংবাহন (মর্দন)।

২৯১ : জল। বিভিন্ন উষ্ণতায় স্নানের উপযোগিতা।

---

(১)

চিকিৎসকের মহৎ ও একমাত্র উদ্দেশ্য হইল রোগীকে স্বাস্থ্যে ফিরাইয়া আনা, যাহাকে বলা হয় আরোগ্য বিধান করা।[১]

ভাষ্য (১) ঃ হানেমানের সময়ে চিকিৎসক সমাজে এইরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল যে রোগের উৎপত্তির মূলীভূত কারণ হইল কোন উগ্র প্রকৃতির জড়ীয় পদার্থ, যাহা শরীরের ভিতর লুকাইয়া থাকিয়া ব্যাধির সৃষ্টি করে। কল্পনা ও অনুমানের ভিত্তির উপরেই এই ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই ধারণার অনুবর্তী হইয়া চিকিৎসকগণের চিকিৎসাপ্রণালী তখন অনুসৃত হইত। তাঁহারা মনে করিতেন যে রোগাৎপাদক মূল কারণটিকে দেহ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিলেই রোগ সারিয়া যাইবে। সেইজন্য তাঁহারা বমনকারক, শ্লেষ্মা ও লালানিঃসারক, ঘর্মোৎপাদক, বিরেচক প্রভৃতি উগ্র ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া সেই দূষিত পদার্থটিকে দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। কখনও চিকিৎসকগণ জোঁক লাগাইয়া রোগীর শরীর হইতে রক্ত বাহির করিয়া দিতেন, তখনও বেদনাস্থানে প্রদাহজনক কোনো উগ্র প্রলেপ লাগাইয়া সেই স্থান পুড়াইয়া ক্ষত উৎপাদন করিতেন। এই সকল প্রক্রিয়ার ফলে রোগী কখনও কখনও সাময়িকভাবে উপশম বোধ করিলেও তাহাতে স্থায়ী কোন সুফল লাভ হইত না। বরং দেহ হইতে রস ও রক্তের প্রভূত অপচয় হেতু রোগী আরও দুর্বল হইয়া পড়িত, এবং তাহার ফলে তাহার রোগপ্রবণতা আরও বাড়িয়া যাইত। হানেমানের যুগের সেই স্থূল ধারণা ও ততোধিক উৎকট চিকিৎসাপদ্ধতি বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে আর প্রচলিত না থাকিলেও রোগোৎপত্তির কারণ যে ভৌতিক পদার্থ অর্থাৎ জীবাণুসমূহ—এই মতবাদ বৈজ্ঞানিক সমাজে এখনও স্বীকৃত। তদনুসারে চিকিৎসারও প্রচলন রহিয়াছে এবং নিত্য পরিবর্তনশীল নূতন নূতন চিকিৎসার ব্যবস্থাও আবিষ্কৃত হইতেছে।

---

১ তাঁহার (চিকিৎসকের) উদ্দেশ্য ইহা নহে যে দেহের ভিতরকার প্রাণক্রিয়ার প্রকৃত স্বরূপ কি, এবং দেহযন্ত্রের অদৃশ্য অভ্যন্তরে কিভাবে পীড়ার উৎপত্তি হয় সে বিষয়ে ফাঁকা কল্পনা ও অনুমানের জাল বুনিয়া তথাকথিত ব্যবস্থাপদ্ধতি তিনি রচনা করিবেন। (এইভাবে কত চিকিৎসক এ পর্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশে তাঁহাদের ক্ষমতা ও সময় নষ্ট করিয়াছেন)। কিংবা ইহাও চিকিৎসকের কাম্য নহে যে একদিকে পীড়িত মানব সাহায্যের আশায় বৃথা দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে আর একদিকে পীড়ার অদ্ভুত বৈচিত্র্য বিষয়ে অগণিত ব্যাখ্যা এবং তাহার আনুমানিক কারণ—যাহা কোনকালেই গোচরীভূত হইবে না)—দুর্বোধ্য ভাষা এবং অসার ও জটিল ব্যঞ্জনার মাধ্যমে প্রকাশ করিয়া অজ্ঞ লোকদের কাছে তাহা পান্ডিত্যপূর্ণ বলিয়া ধারণা জন্মাইয়া দিয়া তাক লাগাইয়া দিবেন। এই প্রকার পান্ডিত্যপূর্ণ অলীক কল্পনা—(যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে তত্ত্বমূলক চিকিৎসাবিজ্ঞান, এবং যাহার জন্য বিশেষ অধ্যাপকপদসমূহের সৃষ্টি করা হইয়াছে)—আমরা অনেক দেখিয়াছি। এখন চিকিৎসক নামধারী সকলেরই সেই সময় উপস্থিত যখন কেবলমাত্র বাগাড়ম্বর দ্বারা আর্ত মানবকে প্রতারিত করা হইতে বিরত হইয়া তাহার পরিবর্তে তাহাদের প্রকৃত সাহায্য ও আরোগ্যবিধানকার্য সুরু করিবেন।

দূরদর্শী হানেমান্ দেখিয়াছিলেন (যাহা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে) যে রোগতত্ত্ব সম্বন্ধে কল্পনামূলক গবেষণার আলেয়ার পিছনে ছুটিতে ছুটিতেই চিকিৎসকের সমস্ত প্রতিভা ও শক্তি ব্যয়িত হইয়া যায়, এবং তাহার ফলে তাঁহারা যে অনিশ্চিত মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন তাহা যেমন ধোঁয়াটে তেমনি জটিল। এইরূপ আনুমানিক সিদ্ধান্ত লইয়া তাঁহারা পান্ডিত্যের গর্বে স্ফীত হইতে পারেন বটে কিন্তু তাহাতে রোগীর রোগনিরাময় হয় না কিংবা তাহার রোগকাতর আর্তনাদ দূরীভূত হয় না। সেইজন্য এই প্রথম সূত্রে ও তাহার পাদটীকায় হানেমান্ চিকিৎসককে তাঁহার কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করিয়া দিয়া বলিয়াছেন যে চিকিৎসকের একমাত্র কর্তব্য হইল রোগীকে আরোগ্য প্রদান করা, কল্পনার বশে অদৃশ্য কারণের কথা অনুসন্ধানে আড়ম্বরপূর্ণ জটিল ধাঁধাঁর সৃষ্টি করা নয়।

এই উক্তি শুধু হানেমানের নিকট হইতেই আমরা পাই তাহা নহে। প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্রেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। মহর্ষি চরক ভেষজ ও চিকিৎসকের যোগ্যতা নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন ঃ

'সেই ভেষজই যথার্থই ঔষধ যাহা রোগ দূর করিতে পারে,

সেই ব্যক্তিই প্রকৃত চিকিৎসক যিনি আরোগ্য প্রদান করিতে পারেন।'

(২)

আরোগ্যবিধানের উচ্চতম আদর্শ হইল দ্রুত, বিনাকষ্টে ও স্থায়িভাবে স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার, কিংবা স্বল্পতম সময়ের মধ্যে, সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ও নির্দোষ উপায়ে, সহজবোধ্য নীতির সাহায্যে সমগ্রভাবে রোগের দূরীকরণ ও বিনাশ।

ভাষ্য (২) ঃ দ্বিতীয় সূত্রে হানেমান্ চিকিৎসার উচ্চতম আদর্শের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে অ্যাসক্লিপিয়েডিস (Asclepiades—খ্রীঃ পূঃ ১২৪) নামক জনৈক গ্রীক চিকিৎসকও উক্ত মর্মে চিকিৎসার আদর্শ সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শের সারমর্ম ছিল : অতিদ্রুত নির্বিঘ্নে ও সুখকর উপায়ে রোগের আরোগ্যবিধান করিতে হইবে। কিন্তু সেই আদর্শ তাঁহার কল্পনাতেই আবদ্ধ ছিল, সুদীর্ঘকাল পরে তাহাকে বাস্তবে রূপায়িত করিলেন হানেমান্।

দ্বিতীয় সূত্রে আদর্শ আরোগ্য প্রসঙ্গে হানেমান্ কয়েকটি শর্ত আরোপ করিয়াছেন। তার প্রথমটি হইল—আরোগ্যবিধানের গতি দ্রুত হওয়া চাই। অবশ্য সকল চিকিৎসাপদ্ধতিতেই দ্রুত আরোগ্যবিধানের কথা স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং এই উক্তি বাহুল্য মনে হইলেও আদর্শ আরোগ্য সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইলে এই প্রয়োজনের স্থান সর্বাগ্রে।

দ্বিতীয় শর্ত হইল, আরোগ্যবিধানকার্যে যতদূর সম্ভব বিনা কষ্টে ও নির্দোষভাবে সাধন করিতে হইবে। আগুনে ঘৃতাহুতি দিবার মতো যদি রোগযন্ত্রণার উপর আরও যন্ত্রণা চাপানো হয় তাহা হইলে রোগীর অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়ে। হানেমানের সময়ে চিকিৎসা ব্যাপারে নানারূপ আসুরিক পদ্ধতি ও প্রকরণের ব্যবস্থা ছিল; এমন কি পচন নিবারণের জন্য কোন আহত অঙ্গকে ফুটন্ত তৈলে কিংবা আলকাতরার মধ্যে ডুবানো হইত। তাহার যে কী ভীষণ যন্ত্রণা তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহার স্থানে কষ্টবিহীন কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারিলে রোগীর পক্ষে কত না সুখের হয়। হানেমান্ সেইজন্যই আদর্শ চিকিৎসার একটি অঙ্গরূপে কষ্টবিহীন চিকিৎসার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অধুনা ইঞ্জেকশনের ফোঁড়াফুঁড়ি ব্যবস্থাকেও অনেকে কষ্টবিহীন চিকিৎসার অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করিতে না পারেন। হানেমানের মনে কিন্তু তৎকালীন উৎকট আসুরিক চিকিৎসার কথাই স্থান পাইয়াছিল।

চিকিৎসার আদর্শ সম্বন্ধে তৃতীয় প্রয়োজন হইল **স্থায়িভাবে** আরোগ্যবিধান। পীড়াহেতু দেহ ও মনে যে অসুখ ও অশান্তি আসে তাহা বিদূরিত করিয়া স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে ফিরাইয়া আনাই হইল চিকিৎসার উদ্দেশ্য। কিন্তু সে উদ্দেশ্য সাধিত না হইয়া যদি শুধু সাময়িক উপশম আসে কিংবা সাময়িক উপশমের পর আবার অন্য কোন উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে সেই চিকিৎসাকে আদর্শ চিকিৎসা কখনই বলা চলে না, এবং তাহা চিকিৎসকের কখনও কাম্য হইতে পারে না।

চিকিৎসার অন্যতম আদর্শ হইল সমগ্রভাবে রোগের দূরীকরণ। পীড়ার যখন উৎপত্তি হয় তখন দেহে ও মনে নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশিত হয়। সেগুলির কয়েকটি উৎকট যন্ত্রণাদায়ক হইতে পারে, আবার কতকগুলি হয়তো অপেক্ষাকৃত কম যন্ত্রণাদায়ক। যদি এরূপভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় যাহাতে লক্ষণগুলির মাত্র আংশিক উপশম হয় তাহা হইলে সেই চিকিৎসাকেও আদর্শ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। সমগ্রভাবে সমস্ত লক্ষণগুলি বিদূরিত হইলে তবেই তাহা আদর্শ চিকিৎসা।

আরোগ্যবিধান নির্দোষভাবে হওয়া চাই। হানেমানের সময়ে শিরা কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়া, কোন স্থান পুড়াইয়া ক্ষত করিয়া কিংবা অন্য কোন উৎকট পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যেসব চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল সেগুলিকে কখনই নির্দোষ বলা চলে না। তাহাতে অতিরিক্ত রক্ত ও রসের ক্ষরণহেতু রোগী স্বভাবতই অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িত এবং তাহার ফলে রোগীর প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় রোগীর অন্য কোন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইবার প্রবণতা বৃদ্ধি পাইত। সুতরাং এই প্রকার ত্রুটি ও দোষযুক্ত চিকিৎসাপদ্ধতিকে আদর্শ চিকিৎসা বলিয়া ধরা যায় না।

সবশেষে হানেমান্ বলিয়াছেন, আদর্শ আরোগ্যের মূলে থাকা চাই—এক সহজবোধ্য নীতি যাহার সাহায্যে অভ্রান্তভাবে চিকিৎসা পরিচালনা করা সম্ভব।

কল্পনা বা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কিংবা ধারণার অতীত কোন ক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া অনেক সময়ে হয়তো রোগের উপশম বা আরোগ্যলাভ সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত কোন সুদৃঢ় নীতির উপর সেই চিকিৎসা প্রতিষ্ঠিত নহে। বিশেষ কোন ক্ষেত্রে উপকার দেখা গেলেও সবক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। গণনার সাহায্যে বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল নৈসর্গিক ঘটনাবলী অভ্রান্তভাবে ঘোষণা করেন তাহার ভিতরে পাওয়া যায় এক অপরিবর্তনীয় চিরন্তন নীতি। সেই নীতি সর্বকালে সত্য ও অমোঘ এবং অনুকরণীয়। কিন্তু যে পদ্ধতির ভিতরে কোন প্রয়োগনীতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না তাহা দুর্বোধ্য, এবং তাহা কখনও চিকিৎসার আদর্শ নীতিরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

(৩)

যদি চিকিৎসকের স্পষ্ট বোধ থাকে পীড়ায় অর্থাৎ প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রে কি সারাইতে হইবে (ব্যাধি সম্বন্ধে জ্ঞান), যদি তিনি জানেন ভেষজসমূহে অর্থাৎ প্রত্যেকটি ভেষজের ভিতরে কি আরোগ্যশক্তি নিহিত আছে (ভেষজশক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান), যদি তিনি জ্ঞাত থাকেন—রোগীর ভিতরে যাহা পীড়া বলিয়া নিঃসন্দেহে জানা গিয়াছে তাহার উপর কেমন করিয়া স্পষ্ট ধারণাযুক্ত নীতি অনুসারে ভেষজের আরোগ্যশক্তিকে প্রয়োগ করিতে হয়—যাহার ফলে আরোগ্যকার্য শুরু হইবে এবং ভেষজটির ক্রিয়াপ্রণালী অনুসারে রোগীর উপর প্রয়োগের যোগ্যতা সম্বন্ধে তাহা সুনির্বাচিত কিনা (ঔষধ নির্বাচন); এবং তাহা ছাড়া ইহা প্রস্তুত করিবার ঠিক পদ্ধতি কি পরিমাণে প্রয়োজন (মাত্রা) এবং পুনঃপ্রয়োগ করিবার উপযুক্ত সময় এবং পরিশেষে প্রত্যেকটি আরোগ্যের ক্ষেত্রে কি বাধা ও তাহা কি উপায়ে দূরীভূত করা হয় তাহাতে আরোগ্যবিধান স্থায়ী হইতে পারে—চিকিৎসকের এই সকল যদি জানা থাকে তাহা হইলে সুবিজ্ঞতা ও বিচারবুদ্ধিসম্মতভাবে কি প্রকারে চিকিৎসা করা যায় তখন তাঁহার বোধগম্য হইবে এবং তিনি তখন আরোগ্য-নৈপুণ্যে প্রকৃত চিকিৎসক।

(৪)

যে সকল কারণ স্বাস্থ্যের বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে এবং পীড়ার উৎপত্তি ঘটায়, স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সেগুলিকে কেমন করিয়া দূরে রাখা যায়, এ সব তথ্য তাঁহার (চিকিৎসকের) জানা থাকিলে তিনি স্বাস্থ্যসংরক্ষকও বটে।

(৫)

রোগ আরোগ্য করিবার সহায়তার জন্য চিকিৎসকের জানা প্রয়োজন—আচির রোগোৎপত্তির পক্ষে অতি সম্ভাব্য উদ্দীপক কারণ (exciting cause)

এবং চিররোগের সমগ্র ইতিহাসে বিশেষ বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি—যাহার দ্বারা তিনি কোন প্রাচীন রোগবিষ দ্বারা উদ্ভুত পীড়ার **মূল কারণের** (fundamental cause) সন্ধান পাইতে পারেন। এই সকল অনুসন্ধানের মধ্যে রোগীর দৈহিক ধাতুপ্রকৃতি (বিশেষত চিররোগে), তাহার নৈতিক চরিত্র ও বুদ্ধিবৃত্তি, তাহার জীবিকা, তাহার জীবনধারণ প্রণালী ও রীতিনীতি, তাহার সামাজিক ও ব্যক্তিগত সম্বন্ধে, তাহার বয়স যৌনপ্রবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়েও অবহিত হইতে হইবে।

ভাষ্য (৩-৫) : রোগবিজ্ঞান—প্রকৃত চিকিৎসক হইতে হইলে যে জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা এই কয়টি সূত্রে হানেমান্ উল্লেখ করিয়াছেন। অর্গানন শিক্ষার মর্মকথা এই কয়টি সূত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। হানেমানের মতে চিকিৎসকের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান প্রয়োজন হইল আরোগ্য-বিজ্ঞানী (therapeutist) হওয়া। যে প্রকার জ্ঞানের সহায়তায় হানেমানের সময়ে চিকিৎসকগণ চিকিৎসাকার্যে ব্রতী হইতেন তাহার ত্রুটি ও বিফলতা হানেমান্ বুঝিয়াছিলেন। তিনি এই কথাই স্পষ্টভাবে নানা প্রবন্ধের ভিতর দিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে **রোগবিজ্ঞান, ভেষজবিজ্ঞান এবং তাহার প্রয়োগবিজ্ঞানই হইল আরোগ্যনীতির মূল কথা।** তাহা হইলে এখন প্রশ্ন আসে, রোগবিজ্ঞান বলিতে আমরা কি বুঝি? বিভিন্ন জাতীয় লক্ষণসম্বলিত এক একটি রোগের নাম ধরিয়া যে গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে এবং তাহা অবলম্বন করিয়া যে চিকিৎসা পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকেই কি রোগবিজ্ঞান বলিয়া বুঝিতে হইবে? এই প্রকার চিত্রে প্রত্যেকটি রোগের কেবল একই প্যাটার্ন, একই ছাঁচ আমাদের মনশ্চক্ষে প্রতিফলিত হয় এবং সেই বাঁধাধরা ছকে ফেলিয়া প্রত্যেকটি রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এখানে রোগ হইল মুখ্য, রোগী হইল গৌণ। সাধারণভাবে একটি নির্ধারিত ছকে ফেলিয়া কোন রোগের একই প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রবর্তন চিকিৎসকের পক্ষে সহজ হইতে পারে কিন্তু তাহাতে শিল্পীসুলভ চিকিৎসাকলানৈপুণ্যের কোন স্থান নাই। প্রত্যেক মানুষের যেমন আকৃতিগত বিভিন্নতা আছে, তেমনি আছে তাহার ধাতু ও প্রকৃতিগত পার্থক্য। সুতরাং সঙ্কলিত গ্রন্থে রোগের যে বর্ণনা থাকে তাহাতে সমগ্রভাবে রোগচিত্র পাওয়া গেলেও রোগীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাহার ঠিক মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রোগীকে আশ্রয় করিয়াই রোগের প্রকাশ, নতুবা রোগের নিজস্ব কোন পৃথক্‌সত্তা বাস্তবজগতে কল্পনা করা যায় না। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিসত্তায় যেমন পার্থক্য রহিয়াছে তেমনই একই নামধেয় রোগের বিভিন্ন প্রকাশে যে বৈচিত্র্য থাকিবে তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই বৈচিত্র্যের প্রতি উপেক্ষা বা অবহেলাই হইল চিকিৎসায় বিফলতার মূলীভূত কারণ। হানেমান্ তাহাই এখানে বলিয়াছেন। সুতরাং চিকিৎসায় সফলতা লাভ করিতে হইলে রোগের বহিরঙ্গ চিত্র সম্বন্ধে যেমন জ্ঞান থাকা চাই তেমনই রোগীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলিও প্রত্যক্ষ করা প্রয়োজন। সেইজন্য হানেমান্ ৩য় সূত্রে প্রত্যেক রোগীর ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আরোগ্যের বিষয় কি তাহা চিকিৎসককে স্পষ্টভাবে

হৃদয়ঙ্গম করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। সকল রোগীকে এক ছকে না ফেলিয়া প্রত্যেকটি রোগীর সম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করাই হইল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বৈশিষ্ট্য। তাহাই হইল আরোগ্যবিজ্ঞান। এযাবৎকাল রোগ সম্বন্ধে শুধু নানা গবেষণা ও তাত্ত্বিক আলোচনা হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা রোগীর ব্যক্তিত্বকে উপেক্ষা করিয়া। হানেমানই সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি রোগীর দিকে ফিরাইলেন।

রোগীর বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে নির্দেশ দিতে গিয়া হানেমান্ perceive কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন; perceive কথাটির ভিতরে শুধু জানা ছাড়া আরও কিছু গভীর ব্যঞ্জনা আছে। জানার ভিতরে আছে শুধু বুদ্ধি ও যুক্তির ক্রিয়া; কিন্তু perceive কথার ভিতরে প্রত্যক্ষ বোধের, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভবের অর্থ প্রকাশ পায়। কোন অখন্ড ব্যক্তিসত্ত্বাকে শুধু তাহার বিষয় বা বস্তুগত জ্ঞান দ্বারা জানা যায় না; তাহাকে সম্পূর্ণভাবে জানিতে হইলে তাহার ব্যক্তিমানসকেও অনুভূতির ভিতর দিয়া বোধ করিতে হইবে। হানেমান্ সেইজন্যই perceive কথাটিকে এখানে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

তাহা হইলে আরোগ্যের বিষয় এখন কি দাঁড়াইল? হানেমান্ সেই প্রশ্নের সমাধানে বলিতেছেন, জীবনীশক্তি কোন অতীন্দ্রিয় বিরুদ্ধ শক্তিদ্বারা বিক্ষুব্ধ হইলে রোগের উৎপত্তি হয় এবং সেই রোগের প্রকাশের একমাত্র পথ হইল দেহের অনুভবশক্তি ও স্বাভাবিক ক্রিয়াসমূহকে বিপর্যস্ত করিয়া। এই অস্বাভাবিক লক্ষণসমষ্টির প্রত্যক্ষবোধের মধ্যেই নিহিত আছে আরোগ্যবিজ্ঞান এবং তাহাই হইবে চিকিৎসকের একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়। রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া যে সকল লক্ষণ সংগ্রহ করা যায় তাহারই মধ্যে ফুটিয়া ওঠে রোগীর চিত্র। এই বাস্তব চিত্রেই পাওয়া যায় রোগের স্বরূপগত প্রকাশ। রোগের সেই স্বরূপগত লক্ষণসমষ্টিকে সম্পূর্ণরূপে ও স্থায়িভাবে দূরীভূত করার নামই হইল আরোগ্যবিধান। রোগের বিষয়গত অন্যান্য লক্ষণ থাকিতে পারে এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে সেগুলির প্রয়োজনও স্বীকার্য। কিন্তু রোগীকে নিরাময় ও সুস্থ করিবার জন্য প্রত্যেক রোগীর শয্যাপার্শ্বে প্রত্যক্ষীভূত ঐ বাস্তব লক্ষণসমষ্টিই একান্তভাবে সহায়ক, সুতরাং গ্রহণীয়।

শারীরবৃত্ত (physiology) এবং বিকারতত্ত্ব (pathology) রোগপরিচয় সম্বন্ধে আমাদিগকে জ্ঞান দান করিতে পারে বটে, কিন্তু সেই জ্ঞান হইতে কখনও রোগীর ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করা সম্ভব নয়, সেইজন্য চিকিৎসাকার্যে এই প্রকার জ্ঞানের পরিপূর্ণ সার্থকতা নাই। প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত লক্ষণসমষ্টি হইল চিকিৎসার পক্ষে একমাত্র অবলম্বনীয়। সেইহেতু লক্ষণসমষ্টির উপর নির্ভর করিয়া চিকিৎসা করা যায় বলিয়া হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতি যেমন সহজ তেমনি আবার শুধু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বাঁধাধরা ছকে চিকিৎসা চলে না বলিয়া ইহা তেমনি কঠিন।

প্রত্যেক রোগীর ব্যক্তিগত লক্ষণসমষ্টি নির্ধারণ এবং স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ (৪র্থ সূত্র) করা ছাড়াও অচির ও চিররোগের পার্থক্য নির্ণয় সম্বন্ধে চিকিৎসকের জ্ঞান থাকা দরকার। অর্থাৎ নবাগত অচিররোগের উদ্দীপক কারণ এবং চিররোগের মূলীভূত কারণ সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। ৫ম সূত্রে হানেমান্ সেই কথা বলিয়াছেন। চিররোগতত্ত্ব সম্বন্ধে হানেমানের গবেষণা সর্বপ্রথমে ১৮২৯ সালে তাঁহার অর্গাননের ৪র্থ সংস্করণে প্রকাশিত হয়। পীড়া সম্বন্ধে অচির ও চির—এই শ্রেণী বিভাগ চিকিৎসাবিজ্ঞানে হানেমানের এক উল্লেখযোগ্য দান। ৭২ সূত্রে অচির ও চিররোগের সংজ্ঞা নির্ণয় করিয়া উভয়ের মধ্যে পার্থক্য তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। রোগ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা হইতে হানেমানের চিররোগতত্ত্ব বিষয়ক চিন্তাধারা সম্পূর্ণ পৃথক এবং তাহা চিকিৎসাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিয়াছে। ৭২ সূত্র এই সম্বন্ধে আলোচ্য।

ভেষজবিজ্ঞান—অতীন্দ্রিয় বিরুদ্ধ শক্তির সংক্রমণে যেমন সুস্থ দেহে রোগের উৎপত্তি হয়, তেমনি ভেষজশক্তিও অনুরূপভাবে সুস্থ দেহে ব্যাধির সৃষ্টি করিতে পারে। হানেমানই এ বিষয় সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ধাতু ও প্রকৃতিগত বিভিন্নতায় প্রত্যেক মানুষের ভিতরে একই রোগের প্রকাশ যেমন বিভিন্ন আকার ধারণ করে তেমনি প্রত্যেকটি ভেষজের অতীন্দ্রিয় ক্রিয়াশক্তি প্রত্যেকটি মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত হইতে পারে। স্বভাবজ ব্যাধির ক্রিয়া যেমন লক্ষণসমষ্টির ভিতর দিয়া রোগীর দেহে আত্মপ্রকাশ করে, এবং রোগশয্যার পাশে বসিয়া সেগুলিকে সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তেমনি সুস্থদেহে ভেষজের প্রয়োগের ফলে যে লক্ষণসমষ্টি প্রকাশিত হয় তাহারই নিরীক্ষার ভিতর দিয়া ভেষজের স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়; ভেষজের পদার্থগত বা রাসায়নিক গুণাগুণের উপর তাহা নির্ভর করে না। সেইজন্য রোগবিজ্ঞান ও ভেষজবিজ্ঞানকে কল্পনা বা তত্ত্বের অস্পষ্টতা হইতে উদ্ধার করিয়া হানেমান্ উভয়কে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার এক অভ্রান্ত ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রত্যেকটি রোগীর ব্যক্তিসত্ত্বা যেমন আমাদের জানা প্রয়োজন, প্রত্যেকটি ভেষজচিত্রও আমাদের তেমনি জানা আবশ্যক এবং এই জ্ঞানলাভের জন্য প্রকটিত লক্ষণসমষ্টির উপরই আমাদের নির্ভর করিতে হইবে, শারীরবিজ্ঞান কিংবা নিদানশাস্ত্রের উপর নহে। বস্তুত রোগচিত্র ও ভেষজচিত্র একটি অন্যটির প্রতিরূপ

তাহা হইলে ভেষজের আরোগ্যকারী শক্তি বলিতে আমরা কি বুঝিব? হানেমান্ এই প্রশ্নের সমাধানে বলিয়াছেন, যে ভেষজশক্তি ক্রিয়াশীল হইয়া সুস্থদেহে বিকৃতি ঘটাইতে পারে, সেই ক্রিয়াশক্তিই অতীন্দ্রিয় গতীয় (dynamic) প্রভাব দ্বারা রোগের লক্ষণসমষ্টিকে দূরীভূত করিয়া স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ। এককথায় বলিতে গেলে, ভেষজের যাহা